বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

মে-জুন, ১৯৮১ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত দাম : ৫০ পয়সা

● আই.এ.সি.এস.—একটি পর্যালোচনা—২ ● জনস্বাস্থ্যনীতি ও ডিপ্লোমা কোর্স—
● পরিক্রমা—৯ ● রিপোর্ট—১১ ● গোপাল ভট্টাচার্য—১৪
● চিঠিপত্র—১৬

সম্পাদকীয়

কলাম্বিয়ার মহাকাশ যাত্রা বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার যেমন উন্মুক্ত কে দিয়েছে তেমনি বয়ে নিয়ে এসেছে যুদ্ধের বিপদসংকেত। দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, আন্ত মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, অন্যান্য সমরাস্ত্রের সমারোহ বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলেছে দুনিয়া জুড়ে সমর বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপকতা। শুধু যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিই সমরাস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে তাই নয় এর সাথে ভারতবর্ষের মত দেশেও নিউক্লিও ও মহাকাশ গবেষণা তোড়-জোড় চলছে। এই ত সেদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা গেল ভারতবর্ষে সম্ভবত আর একটি বোমা তৈরির প্রস্তুতি চলছে এবং সেটি হাইড্রোজে বোমা হওয়া অসম্ভব নয়। এই ধরনের বিধ্বংসী সমর বিজ্ঞানের গবেষণার দিকে ভারতবর্ষের মত পিছিয়ে থাকা দেশও ঝুঁকে পড়েছে। নিউক্লিও প্রকল্পগুলি ভারতবর্ষে অগণিত সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে না এলেও সারা বিশ্বব্যাপী দুনিয়াকে ভাগবাঁটোয়ারা জন্য যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চলছে তার সামিল হতে এই সমস্ত দেশগুলিও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। হায়দ্রাবাদে নিউক্লিও জ্বালানীর সংস্থায় বিস্ফোরণ, নতুন ছ'টি নিউক্লিয়ার রিয়্যাকটর বসানোর পরিকল্পনা এবং নিউক্লিও ও মহাকাশ গবেষণার দিকে অস্বাভাবিক ঝোঁক ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সমর বিজ্ঞানে গবেষণার প্রশ্নটিকে মূর্ত করে তুলেছে। এই ব্যয়বহুল বিধ্বংসী প্রকল্পগুলি শুধুই বিলাসিতা না নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলের অংশবিশেষ হয়ে যুদ্ধসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলার পদক্ষেপ, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে বিজ্ঞানকর্মীরা। তারাপুরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কল-কাঠি নাড়া বন্ধ হলেও নতুন প্রকল্পে যে আর কোন শক্তির মদত থাকবে না তার কোন গ্যারান্টি কি আছে? সমরাস্ত্রের গবেষণা ও তার প্রয়োগ আজকের বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে যে প্রশ্ন তুলে ধরেছে তা নিঃসন্দেহে জটিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে বার্নাল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও বিজ্ঞানের সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে জনমানসে বিশেষ করে বিজ্ঞানকর্মীদের ভেতর চেতনা সৃষ্টি করার আন্দোলন এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কর্মীদের কাছে পাথেয় হতে পারে।

যেমন বিজ্ঞান গবেষণার অপব্যবহার সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে চাই তেমনি বিজ্ঞান গবেষণাগারের অভ্যন্তরে কি চলছে সে সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে চাই। এই কথা মাথায় রেখে শতবর্ষাধিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করছি। সাম্প্রতিককালে বহু-আলোচিত ও বিতর্কিত ডি. সি. এম. এস. কোর্স (ডিপ্লোমা মেডিকেল কোর্স) সম্পর্কে মেডিকাল ছাত্রের ভাবনাও এই সংখ্যায় থাকছে।

'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা'র বার্ষিক সাধারণ সভা
২৭শে মে, ১৯৮১, বিকেল ৩টা
বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ ॥ কলিকাতা

ভারতে প্রথম গবেষণাকেন্দ্র আই.এ.সি.এস. একটি পর্যালোচনা

[The history of the Indian Association for the Cultivation of Science since its inception is traced. The growing stagnation in terms of quality and quantity of research, and in terms of grant of funds and development is underlined. It is pointed out that the authoritarian attitude of the administration is vitiating the academic atmosphere of this institution of tominence.]

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স। সংক্ষেপে 'কালটিভেশন'। ভারতের প্রথম, বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬। গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে দ্বিতীয়, কারণ প্রথমটি এশিয়াটিক সোসাইটি। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ ইতিমধ্যেই বয়েসে নবীন। আধুনিক শিক্ষার, আধুনিক চিন্তার প্রসার হচ্ছে দ্রুত, শহরে ও শহরতলীতে। একদল বুদ্ধিজীবী জমিদার ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে নেমে পড়েছেন। এঁরা ইংরেজের প্রযত্নে লালিত এবং এদেশে আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তার বিকাশে পরম উৎসাহী। মহেন্দ্রলাল সরকার,—সেকালের এক প্রখ্যাত ডাক্তার এই পরিবেশেই মানুষ এবং এঁদেরই একজন। তাই তিনি ভাবলেন বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র থাকা দরকার। Hindoo Patriot পত্রিকায় ১৮৬০ দশকের শেষ দিকে এর প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে তিনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। নাম 'On the desirability of a national institution for the cultivation of science by the natives of India'। সেই শুরু। তারপর Hindoo Patriot পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অনুদান আহ্বান করা হল। পাওয়াও গেল। দিলেন বড় বড় জমিদার আর ছোট ছোট রাজারা। সব মিলিয়ে ৬১০০০ টাকা। ১৮৭৫ সালে প্রথম মিটিং হল সেনেট হলে। মহেন্দ্রলাল সরকার বললেন তাঁর প্ল্যান। মিটিং হলো আরো বার কয়েক। ডিসেম্বর মাসে, সংগৃহীত ৮১০০০ টাকা নিয়ে ট্রাষ্ট গঠিত হল। রইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ। তাছাড়া এ্যড হক কমিটি। মহেন্দ্রলাল সরকার হলেন সেক্রেটারী। আনুষ্ঠানিক ভাবে এ্যাসোসিয়েশনের জন্মকথা ঘোষণা হল ১৮৭৬ সালে। তৎকালীন গবর্ণর রিচার্ড টেমপল ছিলেন এই প্রচেষ্টার সারাক্ষণের সঙ্গী। তিনি ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীটা দান করলেন। প্রতিষ্ঠা হলো কালটিভেশনের। সময়টা ২৯শে জুলাই, ১৮৭৬।

গবেষণা করতে গেলে আয়োজন লাগে অনেক কিছুরই, আর তাতে সময় লাগে অনেক। ইতিমধ্যে ঠিক হল কিছু লোককে বিজ্ঞানের ট্রেনিং দেওয়া হবে। পড়াশুনা হবে, ক্লাস হবে, ল্যাবোরেটরীর কাজও হবে অল্পস্বল্প। সেইমত কাজ শুরু হলো। বক্তৃতার বিষয় পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন। দিলেন অনেকেই, তাঁদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল সরকার, তারাপ্রসন্ন রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চুনীলাল বসু আছেন। ১৮৮৫ সাল নাগাদ জগদীশচন্দ্র বসু ল্যাবোরেটরী চালু করলেন। এই ভাবে চলল বছর পঁচিশ। এ সময়ে আর যাই হোক গবেষণা হয়নি। তার কারণ অনেক। প্রধানত অর্থ আর স্থায়ী গবেষকের অভাব। নানা ভাবে অর্থ যোগানের চেষ্টা হল। কিছু পয়সা পেলেও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। মহেন্দ্রলাল সরকার গবেষণার কাজ দেখে যেতে পারেন নি। ১৯০৪ সালে তিনি মারা গেলেন। ছেলে অমৃতলাল সরকার হলেন সেক্রেটারী। ইতিমধ্যে লাইব্রেরী তৈরী হয়েছে, ছোটখাট workshopও গড়ে উঠেছে। তাও গবেষণায় বিশেষ উদ্যোগ পাওয়া গেল না। ১৯০৬ সাল নাগাদ আবহাওয়া সংবাদ সরবরাহ করা শুরু হলো। তার সঙ্গে রুটিন পড়াশুনা। এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম জীবন এই ভাবেই কেটেছে।

১৯০৭ সালে এলেন রমন। এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল অফিসের অফিসার, অবসর সময়ে গবেষণায় ইচ্ছুক। প্রধানত তাঁর উদ্যোগে গবেষণার কাজ শুরু হলো। বিষয় sound, theory of musical instruments, viscosity ইত্যাদি। ল্যাবোরেটরীও নতুন ভাবে গঠন করা হল। নতুন উদ্যোগের ফল পাওয়া গেল ১৯০৮ সালেই। রমনের প্রথম কাজ Nature পত্রিকায় ছাপা হল। প্রধানত কাজ হত [১] Sound & Vibration [২] Theory of musical instruments [৩] Colloid Studies ইত্যাদি বিষয়ে। রমনের সঙ্গে ছিলেন আরো অনেকে। ১৯১৮-১৯ সাল পর্যন্ত রমন ও তাঁর

সঙ্গীদের মোট ১৮টি কাজ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯১৭ সালে পালিত অধ্যাপকের পদে রমন যোগ দেবার পর আরো অনেকে গবেষণায় যোগ দেন। এই সময় থেকে এ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে গবেষণা হতে লাগল। নতুন গবেষণার সূত্রে আরো টাকা পাওয়া গেল। লাইব্রেরী আর ওয়ার্কশপ-এর জন্য। বিহারীলাল মিত্র একাই দিলেন এক লাখ টাকা। সরকার নিজেই এগিয়ে এল। ১৯১৯ সালে অমৃতলাল সরকার মারা যাবার পর রমন হলেন সেক্রেটারী। ১৯১৮ সালের পর কিছু নতুন বিষয়ে কাজ শুরু হল। Molecular Scattering & Electro and magneto optic effect, Raman effect ইত্যাদি। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। সে সময় রমন ও তাঁর সঙ্গীরা অন্তত ২৫০টি কাজ বিভিন্ন জার্নালে ছাপিয়েছেন, রমন ছাড়াও রমনের সঙ্গে কাজ করেছেন আরও ৬০/৬৫ জন মত। তাঁদের মধ্যে ২৫ জন মত বাঙালী, বাকীরা দক্ষিণ ভারতীয়।

প্রথম প্রথম অনেক কাজই আলোচনায় পড়া হোত। ক্রমশ তার থেকে জন্ম নিল Annual Science Convention। ১৯১৭ সালে প্রথম Convention হয়। পদার্থবিদ্যায় নয়টি, রসায়নে চারটি, বায়োলজিতে সাতটি পেপার সেখানে পড়া হয়েছিল। Annual Report এর সঙ্গে সঙ্গে এই লেখাগুলি ছাপা হোত। পরে আলাদা ভাবে Proceedings of I. A. C. S. নামে ছাপা হোত। কিন্তু রমন ও সঙ্গীদের কাজের সংখ্যা ক্রমশ অনেক বেড়ে যাওয়ায় ১৯২৬ সালে প্রথম Indian Journal of Physics এর জন্ম হয়। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে অন্তত ৬০টি কাজ এই জার্নালে ছাপা হয়েছিল। রমনের বিখ্যাত কাজ 'রমন এফেক্ট' এর অন্তর্ভুক্ত।

১৯২১ সালে রমন ইউরোপ গেলেন। ১৯২৪ সালে তিনি হলেন FRS। ১৯২৫ আবার রাশিয়া ভ্রমণ। ১৯২৮ সালে তিনি পেলেন নাইট উপাধি। তারপর ১৯৩০ সালে বিজ্ঞানীর সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার। স্বভাবতই বিশ্ববিখ্যাত হলেন রমন। খ্যাতি বাড়ল কালটিভেশনের সেই সঙ্গে IJP-র। সুফল হল এই যে আরো অনেক অনুদান পাওয়া গেল। সরকার নিজেই বার্ষিক ২০০০০ টাকা দেওয়া স্থির করলেন।

১৯৩৩ সালে চলে গেলেন রমন ব্যাঙ্গালোর। লোকে বলে রমনকে নাকি চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। অভিযোগ তাঁর অবস্থানের সূত্রে দক্ষিণীরা জায়গা দখল করে ফেলছিলেন। শোনা যায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মেঘনাদ সাহার মত ব্যক্তিরা নাকি এর পিছনে জড়িত ছিলেন। অবশ্য শোনা কথা বাদ দিলে আমরা দেখলাম রমন চলে গেলেন, এলেন কৃষ্ণান। এবার আর সেক্রেটারী নয়, মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে একটি অধ্যাপকের পদ তৈরী করে কৃষ্ণানকে আহ্বান করা হল। প্রশাসনিক ক্ষমতাও দেওয়া হল তাঁকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে নতুন কয়েকটি বিষয়ে গবেষণা শুরু হল যেমন প্রধানত Crystal Magnetism। এই বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের সূত্রে তিনি FRS নির্বাচিত হলেন ১৯৩৮ সালে। এছাড়া Semi conductors বিষয়ে কাজকর্মও এই সময় শুরু হয়। দেখতে দেখতে এসে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বোমা পড়ার ভয়ে অনেক দামী যন্ত্রপাতি নদীয়ার এক গোপন জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কৃষ্ণান বেশীদিন থাকেন নি। ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ চলে যান। এই সময় থেকেই এ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। তার ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীনতার পর নতুন জায়গায় নতুন ভাবে অ্যাসোসিয়েশনকে গড়ে তোলা হয়। আজকের কালটিভেশন তারই পরিণতি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল অ্যাসোসিয়েশনের জীবনে দ্বিতীয় পর্যায়। পরিকল্পনা প্রধানত মেঘনাদ সাহার, অর্থের যোগান দিয়েছে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকার। নতুন বাড়ী তৈরী হল যাদবপুরে। ১৯৪৬ সাল নাগাদই ঠিক হয়েছিল যে ছয়টি বিভাগে সাজানো হবে কালটিভেশনকে। সেগুলি হল (১) General Physics, X-Ray & Magnetism (২) Optics (৩) Theoretical Physics (৪) Physical Chemistry (৫) Inorganic Chemistry (৬) Organic Chemistry। ঠিক হল প্রত্যেক বিভাগে একজন Professor-এর অধীনে বিভিন্ন সংখ্যক স্থায়ী অ্যাকাডেমিক ও নন অ্যাকাডেমিক পদ তৈরী হবে। পরিবর্তন হল আরো অনেক, স্থায়ী ডিরেকটর পদ তৈরী হল। তৈরী হল কাউন্সিল, আরো অনেক কমিটি। ডিরেকটর হয়ে এলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। সাধারণ সভা আগের মত থাকলো বটে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কাউন্সিল হয়ে দাঁড়াল সর্বোচ্চ নিয়ন্তা, অর্থসাহায্যের ব্যাপারটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। সরকার নিজেই চাইলেন অর্থ যোগানের ভার নিতে। সরকারী অর্থসাহায্য এল ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে এল নানা সরকারী আইনকানুন, নানা বিধিনিষেধ, নানা কমিটি, নানা পেন্সেল বোনাস ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। প্রধানত সরকারী দেখাশুনার দৌলতেই অ্যাসোসিয়েশনের ইনফর্মাল পরিবেশ গেল নষ্ট হয়। অ্যাসোসিয়েশন ক্রমশ তার স্বাতন্ত্র্য হারাল।

১৯৪৭ সালেই কেন্দ্রীয় সরকার দিলেন ২,৬৬,৭০০ টাকা, নতুন প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করার জন্য। পরে বাড়ী তৈরীর জন্য মোট ১৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে। এছাড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে, ষ্টাফ, ল্যাবোরেটরী, ওয়ার্কশপ-এর জন্য ২১·৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। এছাড়া প্রতি বছর রেকারিং খরচ বাবদ পাওয়া গেল ৫০০,০০০ টাকা। আজকের অ্যাসোসিয়েশন

ড় ওঠার পিছনে এই প্রাথমিক অর্থসাহায্যের অবদান অনেকখানি। ৫৬/৫৭ সাল নাগাদ দুটি বিভাগ আলাদা খোলা হল। agnetism আর Macromolecules।

আজকের অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে কিছুটা সম্যক ধারণা পেতে লে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে নিচের তালিকাটি াম। অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল। পরি-খ্যানের প্রধান সূত্র বার্ষিক রিপোর্ট। সেগুলি এতই জটিল ও ারিস্কার যে তার থেকে আদৌ কোন ধারণা তৈরী করা খুব । এছাড়া প্রয়োজনীয় তথ্যের অনুল্লেখ বা জটিল উল্লেখ দুই ছে। এ সবের ফলে পরিসংখ্যানে নানা দুর্বলতা রয়ে গেল। চেরা বিশ্লেষণের কথা না ভেবে শুধুমাত্র পরিচয়ের উদ্দেশ্যে লিকাটিকে দেওয়া হল।

	৬০/৬১	৬৪/৬৫	৬৮/৬৯	৭৩/৭৪	৭৮/৭৯
রেকারিং	৮,২০,২৪৪/-	১৬,৯৭,৫৮৩/-	১৭,০২,২৫৬/-	২৬,৩৯,৪৪৩/-*	৩৫,৮৭,৫০০/-*
নন-রেকারিং	৩,৯৫,০০০/-	৫,০০,০০০/-	৩,৫০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১৭,১৮,০০০/-
স্কীম†	—	১,৬৫,৬১৩/-	১,৩৮,৮৭০/-	১,২৯,৮৬৬/-	১৮,১০,১৭২/-
	(১৬)	(১৪)	(১৬)	(১৪)	(১৩)
স্কলারশিপ **	৭১,৯৪৪/-	৮৪,১৬২/-	১,১৫,৩৯৫/-	১,০১,৩১৮১/-	—
	(২৬)	(৩৪)	(৩৬)	(৩৭)	
মোট ভল্যুম	১৪,৮৫২টি	১৯,১২২টি	২২,৬০৬টি	২৭,৫৬৩টি	৩৫,৮১৪টি
জার্নাল	৩৫৪টি	৫৫৯টি	৫২৬টি	৪৯২টি	৫৩৬টি
কাজের বিষয়	৩৪টি	৪৯টি	৫০টি	৫১টি	৭৩টি
পেপার	৫৪টি	৮২টি	৮২টি	৮১টি	১২৫টি
অ্যাকাডেমিক স্টাফ				৫০ জন	৬২ জন
পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি	৪ জন	৯ জন	১৯ জন	১৮ জন	১৭ জন
প্ল্যান্ট গ্রান্ট				৪,৯৮,৩৫৬/-	১৪,৯১,০০০/-

১) ব্র্যাকেটভুক্ত সংখ্যাগুলি স্কীম বা স্কলারশিপ-এর সংখ্যা।
* প্ল্যান্ট গ্রান্ট
† স্কীম সম্পর্কিত তালিকাটি approximate.
** স্কলারশিপ এর মধ্যে স্কীমের টাকা এবং স্কলাররা আছে।

তালিকাটি থেকে বোঝা যায় অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে খুব একটা র্ণ্য সরকার করে নি। স্কীম এবং নন রেকারিং গ্রান্ট এক সঙ্গে খলে বোঝা যায় যন্ত্রপাতি কেনার টাকাও এসেছে বিস্তর। ৭৮/৭৯ লে তালিকাভুক্ত টাকা ছাড়াও কিছু বিশেষ যন্ত্র কেনার জন্য ,০০,০০০ টাকা এসেছে। অথচ এ্যাকাডেমিক স্টাফের সংখ্যা /৭৯ সালে মাত্র ৬২, অর্থাৎ বিভাগ পিছু ৭/৮ জন করে। এর সঙ্গে কারিং গ্রান্টের বহর দেখলে মনে হবে নন-এ্যাকাডেমিক স্টাফ তুলনায় বেশী বেড়েছে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত নন এ্যাকাডেমিক স্টাফদের কোন সংখ্যার উল্লেখ annual report-এ নেই। তবে এখন নন-এ্যাকাডেমিক স্টাফ-এর সংখ্যা সব মিলিয়ে ৩১৯ জন মত। স্কলারদের মোট সংখ্যা তালিকা থেকে বোঝা যায় না, যদিও এখন সংখ্যায় সবশুদ্ধ ১১০ জন অর্থাৎ বিভাগ পিছু গড়ে ১৩/১৪। ৭/৮ জন অ্যাকাডেমিক স্টাফ এর সংগে ১৩/১৪ জন স্কলার—অর্থাৎ গড়ে প্রতি এ্যাকাডেমিক স্টাফ পিছু ২ জন করে স্কলার। Ratioটি খুব impressive নয়। অ্যাসোসিয়েশন-এর ১০০ বছরাধিক ইতিহাসের তুলনায় বেশ কম। লাইব্রেরীতে মোট ভল্যুম বাড়লেও, প্রধানত বাধানো জার্নালই বেড়েছে। বইএর সংগ্রহ অত্যন্ত নগণ্য তবে জার্নাল সংগ্রহ নিঃসন্দেহে বেশীরভাগ গবেষণাকেন্দ্রের তুলনায় ভাল। যদিও ৬৪/৬৫ সালের সর্বোচ্চ সংখ্যা আর ছোঁওয়া যায় নি। কাজের বিষয় এবং অ্যাকাডেমিক স্টাফের সংখ্যা তুলনা করলে মনে হবে এক জন মোটামুটি এক একটি বিষয়েই কাজ করেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না, সাধারণত প্রত্যেকটি এ্যাকাডেমিক স্টাফ দুটি কি তারও বেশী কাজে জড়িত থাকেন। তার মানে এই দাঁড়ায় যে অনেক এ্যাকাডেমিক স্টাফেরই কোন assigned job নেই, এবং একথাটা অনেকটাই সত্যি। পেপার সংখ্যা অন্য অনেক তুলনীয় Insitute-এর তুলনায় বেশী এবং এটাই এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে একমাত্র Strong point। থিসিসের সংখ্যা বছর বছর পালটায় তবে পেপার সংখ্যা এবং থিসিসি-এর সংখ্যা যত বেশীই মনে হোক না কেন গড়ে ৪½-৫ বছর সময় লাগে।

[শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

জনস্বাস্থ্য-নীতি ও ডিপ্লোমা মেডিকাল কোর্স ঃ একটি মত

This is the second article on the debatable DCMS course, the first one published in the March-April 1981 issue of Vijnan-O-Vijnankarmi, which is by and large opposed by the medicos. The author, a Madical Student, is arguing that where health policy of the Government is anti-people the introduction of a new course takes its shape like the older course. The propaganda of making "Basic Doctors" is a great hoax. The pro-people health policy requires a greater number of health workers, auxiliary forces, paramedical staff and proper maintenance of the Health Centres. In his opinion, where anti-people health policy is pursued, the introduction of the New DCMS course is a stunt.

রাজ্য সরকার প্রবর্তিত তিন বছরের ডিপ্লো া মেডিকাল কোর্স, যার নাম DCMS (Diploma in Community Medical Service), সাম্প্রতিককালে এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং এই বিতর্ক আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার স্বরূপ প্রকাশ করবার সাথে সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনে নতুন করে ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। রাজ্য সরকার এই স্বল্পমেয়াদী ডাক্তারী পাঠক্রম (যার পূর্বনাম ছিল Community Medical Practitioner বা CMP কোর্স) প্রবর্তন করে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের দিকে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে দাবী করছেন। অন্যদিকে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশান (IMA) ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেল্‌থ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশান (WBHSA), ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কাউন্‌সিল (MC) এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোর ছাত্রসংসদ বলছেন রাজ্য সরকারের এটি একটি স্টান্ট বা ধাপ্পা এবং (DCMS) কোর্স অবৈজ্ঞানিক। আসুন, বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা এই কোর্সের যৌক্তিকতা বিচার করি।

স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সরকারী ঔদাসীন্য

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নিই যে আমাদের স্বাধীনতা(?)-র ৩১ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের আগে সরকারের (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয়ই) কোনো স্বাস্থ্যনীতি ছিল না। স্বাস্থ্য বিষয়ে সরকার কতখানি উদাসীন তা এতেই প্রকাশ পায়।

২০ বছর আগে গঠিত মুদালিয়র কমিশনের অভিমত যে অর্থনৈতিক বাজেটের অন্তত ১০ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত। সেখানে ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ এইরূপ ঃ

পরিকল্পনা	বাজেটের যত অংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ
১ম	৩·৩%
২য়	৩·০%
৩য়	২·৬%
৪র্থ	২·১%
৫ম	১·৭%
৬ষ্ঠ	১·৯%

পরিষ্কারভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় কমছে। কারণস্বরূপ বলা যায় আমাদের শাসক দলগুলো স্বাস্থ্যকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং যেহেতু স্বাস্থ্য একটি অনুৎপাদনমূলক প্রকল্প সেহেতু তা সরকারের উদাসীনতার শিকার। এরই পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমার সাথে সাথে সামরিকখাতে দ্রুতহারে ব্যয়বৃদ্ধি হয়ে চলেছে।

১৯৮০-৮১ সালে সামরিকখাতে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছিল ৩৮০০ কোটি টাকা, এবছর (৮১-৮২) তা বেড়ে হয়েছে ৪২০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ শুধু এক বছরেই বেড়েছে ৪০০ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য ও পুলিশ-মিলিটারীখাতে ব্যয়ের তুলনামূলক হিসেব ঃ

কাল	ব্যয় বরাদ্দ জনস্বাস্থ্য (কোটি টাকায়)	ব্যয় বরাদ্দ পুলিস মিলিটারী (কোটি টাকায়)	পুলিস মিলিটারিখাতে ব্যয় জনস্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের কতগুণ বেশী
৩য় পরিকল্পনা	২২৫·৯	৩২৯৩·১	১৪·৬
বার্ষিক „	১৪০·১	২৯১০·২	২০·৮
৪র্থ „	৪২৩·৫	৭২৩০·২	১৭·১
৫ম „	৬৮১·৬	৯৯৫১·০	১৪·৬
'৬১-'৭৮ মোট	১৪৭১·১	২৩৩৮৪·৫	১৫·৯

অর্থাৎ '৬১ থেকে '৭৮ এই পর্বে পুলিশ মিলিটারী খাতে ব্যয় হয়েছে জনস্বাস্থ্য খাতের প্রায় ১৬ গুণ বেশী।

এই রাষ্ট্রকাঠামোয় যে সরকারই আসুন না কেন (তা বাম, ডান যাই হোক না কেন) তার পক্ষে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান রক্ষা করা সম্ভব নয়।

অপুষ্টি রোগ এবং চিকিৎসক

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে পুষ্টি এবং পরিবেশ। দারিদ্র্য এবং সেইহেতু

অপুষ্টি আমাদের দেশের মানুষের জীবনকে কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে তা নীচের পরিসংখ্যান থেকে পরিস্ফুট হবে।

*[১] ভারতে অপুষ্টিতে যাঁরা ভুগছেন তাদের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ২ গুণ

*[২] ভারতে বর্তমানে ৬০০ লক্ষ শিশু অপুষ্ট

*[৩] প্রতিমাসে ১ লক্ষ শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে মারা যায় এবং প্রায় ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়

অপুষ্টিজনিত রোগ সারানো যেতে পারে একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে, ওষুধ দিয়ে নয়। সুতরাং এই রোগ দূর হবে সেই সামান্য ব্যবস্থায় যেখানে মানুষ পেট ভরে খেতে পাবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যেখানে একজনের চোখের কর্ণিয়া (Cornea) অন্য জনের চোখে লাগানো হচ্ছে (Cornea Grafting) সেখানে সামান্য ভিটামিন 'এ'-র অভাবে শিশুরা অন্ধ হয়ে যায়। অজস্র অর্থ ব্যয়ে উৎক্ষিপ্ত আর্যভট্ট বা রোহিণী আকাশ থেকে বোধ হয় দেশের এইসব চিত্র তুলবে।

শুধু এই নয়, পুষ্টির অভাব আমাদের মায়েদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়

* গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের শতকরা ৭০ ভাগই রক্তাল্পতায় ভোগেন।

* প্রসূতি মৃত্যুর হার হাজারে ৪ অর্থাৎ প্রতি হাজার শিশুর জন্ম হলে ৪ জন প্রসূতি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রক্তাল্পতা বা Anaemia-তে প্রয়োজন আয়রন এবং প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। কারণ রক্তে RBC বা লোহিত কণিকামধ্যস্থ হিমোগ্লোবিনের হিম্ (Heme) অংশে আয়রন থাকে এবং গ্লোবিন অংশ প্রোটিন। মানলাম, ডাক্তার না হয় আয়রন ট্যাবলেট দেবে কিন্তু প্রোটিন না পেলে মানুষের রক্তাল্পতা ডাক্তার কি জাদু দিয়ে সারাবে?

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রচারপত্র প্রকাশ করেছেন (কমিউনিটি মেডিকাল সার্ভিস কোর্স কি ও কেন) সেখানে বলেছেন:

"গ্রামবাংলার ব্যাধির প্রকোপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৭০ ভাগ রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তাছাড়া শতকরা ৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং অধিকাংশই অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন।"

আবার বলছেন: "গ্রামবাংলার দূষিত জল, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও অপুষ্টিই অধিকাংশ রোগের উৎস"।

প্রশ্নটা এখানেই: MBBS বা DCMS যে ডাক্তারই হোক্ না কেন সে এই অবস্থায় কতখানি উপকারে আসবে? দূষিত জল বা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ডাক্তার দূর করতে যাবে?

বুদ্ধি বিবেচনা এবং যুক্তি দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে গ্রামাঞ্চলের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আজ সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হলো জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা, Village Health Worker বা স্বাস্থ্যকর্মী আরও বাড়ানো এবং পাশাপাশি পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সমিতি গঠন করে তার মাধ্যমে (পঞ্চায়েত দিয়েও করা সম্ভব) পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মসূচী দিয়ে কাজ করা এবং মানুষের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যাপকভাবে প্রচার করা। জনস্বাস্থ্য এমনই এক ব্যাপক স্বাস্থ্য আন্দোলন যেখানে মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ চেতনা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এখানে ডাক্তার বা চিকিৎসার ভূমিকা মোটেই মুখ্য নয়। একটু বিস্তৃত আলোচনা করলে স্পষ্ট হবে।

জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় Health Manpower বলে একটি কথা আছে যার মধ্যে ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে নার্স, প্যারামেডিকাল ষ্টাফ, স্বাস্থ্যকর্মী সবাই পড়ে। এই Health Manpower একটি পিরামিডের মত যার তলায় থাকে স্বাস্থ্যকর্মী বা Health Worker, মধ্যের দিকে থাকে Technical Staff, Auxiliary Staff (WHO-র কথানুযায়ী: "An auxiliary is defined by WHO as technical worker in a certain field with less than full professional training.") এবং চূড়াতে থাকে ডাক্তাররা।

এবার আমাদের দেশের অবস্থাটা দেখুন:

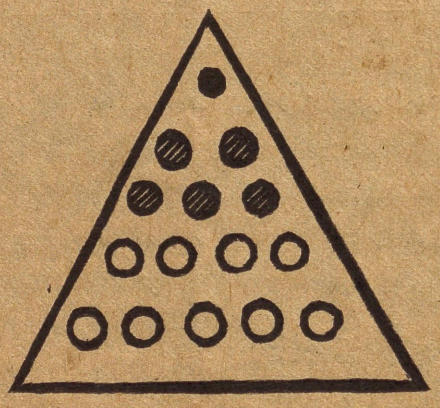

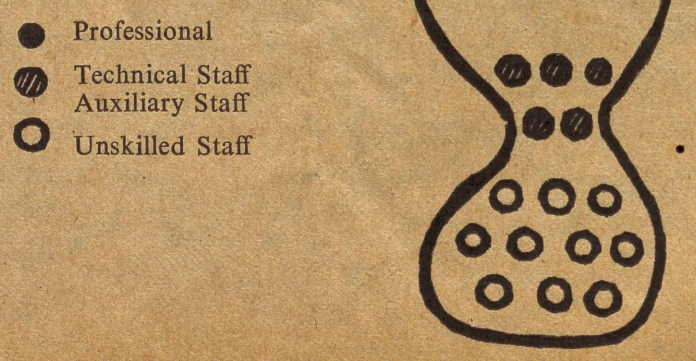

১: নিশান ২: Statesman 31.12.78 ৩: Statesman 31.12.78

"A curious phenomenon in many underdeveloped countries including India is that the pattern of man-power distribution is more 'hour-glass' shaped rather than a pyramid with abundance of doctors at the top, fewer auxiliaries in the middle and a large number of unskilled orderlies at the bottom."

(Text-book of Preventive & Social Medicine : Park & Park ; 8th Edition, Chapter : Health Care of the Community).

সুতরাং তলা থেকে এই পিরামিডের বনিয়াদ শক্ত না করে যদি ডাক্তারই শুধু তৈরী করা হয় তাহলে কোনোদিনই সমস্যার সমাধান হবে না কারণ এই প্রচেষ্টাই অবৈজ্ঞানিক আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব "In many countries, the efficiency of health services is being increased by greater use of auxiliaries."

(Same ; Park & Park ; 8th Edition)

MBBS ও DCMS

১৯৭৯ সাল থেকে প্রবর্তিত ৪½ বছরের MBBS কোর্স মেডিক্যাল কলেজগুলোতে চালু আছে। ব্রিটিশদের তৈরী সেই মাথাভারী সিলেবাসের বোঝা আজও বর্তমান। সেই ঔপনিবেশিক পদ্ধতি আজও আছে যেটা একটা যন্ত্রের মত প্রতি বছর কিছু স্টেথোধারী উৎপাদন করে যাদের সাথে সামাজিক প্রয়োজন খাপ খায় না। MBBS কোর্স সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য :

প্রচলিত মেডিকাল শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি শহরকেন্দ্রিক এবং এই পাঠক্রমে রোগ প্রতিরোধের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয় রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে। বামফ্রন্ট যা বলেননি বা চেপে গেছেন তা হ'ল MBBS ডাক্তাররা Multinational Drug Company-র prescribing agent. সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে আমাদের দেশে MBBS তৈরী হয় না, এই ডাক্তাররা ধনীদেরই সেবা করবার যন্ত্র হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয়। তাই আজ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে মেডিকাল শিক্ষাকে শহরকেন্দ্রিকতার আবর্ত থেকে মুক্ত করে Basic Doctor তৈরীর দিকে লক্ষ্য করে সংস্কার করা হচ্ছে।

Preventive & Social Medicine বর্তমান MBBS কোর্সে অবহেলার শিকার এবং এমনভাবে পড়ান হয় যে পরীক্ষাপাশ ছাড়া আর কোনো কাজে তার প্রয়োগ ঘটে না।

Anatomy মেডিকাল ছাত্রদের একটি বিভীষিকা ; বিশালায়তন Gray's Anatomy এক দুঃস্বপ্ন। Anatomy-তে যা পড়ান হয় তার বেশীর ভাগই কাজে লাগে না।

MBBS কোর্সের বিশদ আলোচনায় না গিয়েও এটা হলফ করে বলা যায় যে এই কোর্স (মেডিকাল কলেজগুলোর বহু শিক্ষকেরও এই মত) আমাদের সামাজিক প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে জনবিরোধী এবং এর পরিবর্তন বা ব্যাপক সংস্কার করা প্রয়োজন যাতে শহরকেন্দ্রিক হাসপাতাল-ভিত্তিক চিকিৎসকের পরিবর্তে "Basic Doctor" তৈরী হয়।

এখনো পর্যন্ত যা জানা গেছে, DCMS কোর্স বর্তমান MBBS কোর্সের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ এবং MBBS-এ যে Preventive & Social Medicine পড়ান হয় এই কোর্সে সেটাই বেশী জায়গা জুড়ে আছে। সেই বলে না, 'থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়' ওরকম ব্যাপার। 'MBBS-রা পল্লীবিমুখ বা শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে'— পুরোনো এবং অবৈজ্ঞানিক কোর্সের সংক্ষিপ্ত রূপ মেদিনীপুর বালুরঘাট প্রভৃতি মফঃস্বল শহরে চালু করলেই শহরকেন্দ্রিক মানসিকতা দূর করা সম্ভব ? মনে হয় না।

গোড়ায় গলদ থাকলে কিছুই সমাধান হয় না, তাই DCMS, MBBS-এর মতই পরিণতি লাভ করতে চলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাসংস্কার যারা করতে গেলেন, তারা MBBS-এর modification করে তাকে Basic Doctors তৈরীর পাঠক্রম কি করতে পারতেন না ? এই সরকার মৌচাকে ঢিল পড়ার ভয়ে সেটা করতে চেপে গেছেন অথচ 'সততা' প্রমাণ করার জন্য ফাঁকা গর্জন করে চলেছেন, ক্রমাগত বিষোদগার করছেন প্রচলিত মেডিকাল শিক্ষার প্রতি।

আরেকটি ব্যাপার সেটি হল খোদ মহাকরণ থেকে কয়েক মিনিটের পথে কলকাতার মেডিকাল কলেজগুলোর অবস্থিতি। ১৯৭৯তে সেখানে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সরকার ৫ বছরের বদলে ৪½ বছরের কোর্সের MBBS কোর্স চালু করেন, যার ফলে '৭৯-র প্রথম ৪½ বছরের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে নামতে হয়েছিল কারণ নবপ্রচলিত ব্যবস্থায় Biochemistry-র শিক্ষক, যন্ত্রপাতি কিছুই আসেনি এবং প্র্যাকটিকাল ক্লাস বন্ধ হয়েছিল। আজও শবব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহের অভাবে কিংবা Instrument-এর অভাবে ক্লাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দীর্ঘদিন যাবৎ বহু শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে। মেডিকাল কলেজগুলোতে এই অবস্থা হলে খুব সঙ্গত কারণেই সন্দেহ জাগে DCMS কোর্স শিক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার কতখানি করতে পারবেন।

ডাক্তাররা কি গ্রামে যেতে চায় না ?

ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না এই কথা এখন ননীবাবু বলছেন, এর আগে অজিত পাঁজাও বলতেন। বস্তুত DCMS চালু করার

আগে এই কথাই বলা হচ্ছিল যে গ্রামে ডাক্তার নেই, তাই সংক্ষিপ্ত ডাক্তারী কোর্স। ১৯৭৯তে যখন ৫০০ পদের জন্য প্রায় ১৫০০ জন MBBS আবেদন করল, সরকার ৩ মাসের মধ্যে কাউকেই চাকরী দিতে পারলেন না প্রশাসনিক ঢিলেমির জন্য, তখন বলতে আরম্ভ করলেন, 'গ্রামে ডাক্তাররা যায় না বা গ্রামে ডাক্তার নেই, এই কারণে স্বল্পমেয়াদী ডাক্তারী পাঠক্রম নয়। এই সংক্ষিপ্ত কোর্সের উদ্দেশ্য জনস্বাস্থ্য চিকিৎসক তৈরী করা।' জনস্বাস্থ্যে চিকিৎসকের ভূমিকা কতখানি আমরা আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। বস্তুত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকলে তাঁরা একথা বলতেন না।

এবছর ৬০০ পদের জন্য আবেদন চাওয়া হয়েছিল, গ্রামে যেতে চেয়ে ৪০০০ জন ডাক্তার দরখাস্ত করেছেন। এর পরও সরকার ৩ মাসের মধ্যে হয়ত চাকরী দিতে পারবেন না, আর ননীবাবু কি বলে চলবেন যে ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চায় না?

আসলে গ্রামে গেলেও ডাক্তাররা সেখানে থাকতে চান না তার কারণ হেল্‌থ সেণ্টারগুলোর শোচনীয় দুরবস্থা। সামান্য যন্ত্রপাতি তো দূরের কথা, ওষুধই সরবরাহ হয় না আর যা ওষুধ দেওয়া হয় তা ঠিকমত দিলে কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সব ডাক্তার নিশ্চয়ই ধোওয়া তুলসীপাতা নন, সেণ্টারের ওষুধ দোকানে বেচে টাকা চুরি করার ঘটনা যেমন আছে তেমনি বহু সৎ ডাক্তারও আছেন (এঁদের সংখ্যা বেশী ছাড়া কম নয়) যাঁরা গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে যথাসাধ্য সেবা করছেন। তাছাড়া হেল্‌থ সেণ্টারে কর্মরত ডাক্তারদের ছুটি বলতে কিছু নেই, নেই আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা। তাই আজ ডাক্তাররা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের মেয়াদ চালু করার দাবী করলে তাকে অযৌক্তিক বলা যায় না। হেল্‌থ সেণ্টারগুলোর আজ যা অবস্থা তাতে একটা নড়বড়ে কাঠের টেবিলে ক্যালেণ্ডারের কাগজ ছিঁড়ে প্রেসক্রিপসন লেখা আর লাল জল-নীল জলের প্রহসন যতদিন চলবে ততদিন ডাক্তার গ্রামে গেলেও পেশাগত অসন্তোষের জন্য সে স্থায়ী-ভাবে থাকতে চাইবে না এটা সুপরিষ্কার।

সরকার কি সত্যিই সচেষ্ট ?

গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নত করতে চাইলে সামগ্রিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচীতে তার অবশ্যই প্রতিফলন ঘটবে। আমরা তার বদলে দেখতে পাই স্বাস্থ্যখাতে এখনও ব্যয়বরাদ্দ অর্থনৈতিক বাজেটের ৪ শতাংশেরও কম (পাঠক আগেই লক্ষ্য করেছেন মুদালিয়র কমিশনের অভিমতে অন্ততঃ ১০ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হওয়া উচিত)। আর এই ব্যয় কিভাবে হয় ?

"More than 50% of the health budget is spent for maintenance and construction of buildings; 20% on salary of the staffs and out of the remaining 25-30%, big and teaching hospitals eat up the lion's share. A very poor portion remains to serve the need of common people." (National Policy to Health Care Delivery; Dr. G. Dutta) শহরের বড় হাসপাতালের পিছনে বেশীরভাগ অর্থব্যয়ের চিত্র এই সরকারের রাজত্বেও বদলায় নি।

একটি প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার তৈরী করতে সরকারের প্রথমে ব্যয় হয় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা এবং সেটি চালাতে বছরে খরচ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা (বর্তমান মূল্যসূচক অনুসারে)। সারা পশ্চিমবাংলায় এরকম ১০০টি তৈরী হেল্‌থ সেণ্টার চালু রাখতে সরকারের ব্যয় ৫ কোটি টাকা কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে বাজেটে অর্থবরাদ্দ কম, তাই যদি বলি সরকার নিজের অক্ষমতার জন্যই গ্রামে গ্রামে হেল্‌থ সেণ্টার খুলবেন না বা বার বার দাবী করা সত্ত্বেও ৩ মাসের মধ্যে গ্রামে যেতে ইচ্ছুক ডাক্তার-দের চাকরী দেবেন না তাহলে কি ভুল বলা হবে ? স্বাস্থ্যখাতের পরিবর্তে পুলিশী খাতে ব্যয় বাড়িয়ে যে জনস্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তন করা যায় না তা সহজেই অনুমেয়।

সুযোগসন্ধানীদের বিরোধিতা

বামফ্রণ্ট সরকারের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই একদল DCMS-এর বিরোধিতা করছেন যাঁদের স্বরূপ জানা দরকার। এঁরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল মেডিকাল ষ্টুডেণ্টস্ এ্যাণ্ড ডক্টরস জয়েণ্ট অ্যাকশন কমিটি (JAC) গঠন করে মেডিকেল কলেজগুলোতে যে হাস্যকর যুক্তি দিয়ে বাহবা কুড়োতে চাইছেন তা হল (১) বিশাল ডাক্তারী পাঠক্রম ৩ বছরে শেষ হয় না তাই DCMS ডাক্তাররা 'half boiled' ডাক্তার। ছেঁদো কথায় চিঁড়ে ভেজে না। ৪½ বছরের ডাক্তাররা সব পণ্ডিত আর ৩ বছরের ডাক্তাররা সব হাতুড়ে এটা কোনো যুক্তি নয়। বিশ্বের অনেক দেশে এখন ৪ বছরে এমন কি ৩ বছরে পর্যন্ত ডাক্তার তৈরী হচ্ছে। আসল ব্যাপার হল বৈজ্ঞানিকভাবে পাঠক্রম তৈরী কিনা, সেটা না হলে ৪½ কেন ৬ বছরেও দক্ষ ডাক্তার তৈরী হবে না। (২) DCMS কোর্সের ডাক্তাররা MBBS ডাক্তারদের ভাত মেরে দেবে—গ্রামে ডাক্তারের সংখ্যা যেখানে ১০ হাজারে ১ জন কিনা সন্দেহ সেখানে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে এরকম কথা যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না।

এই JAC, সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এখানে স্বল্পমেয়াদী ডাক্তারী পাঠক্রমের বিরোধিতা করছে কিন্তু মহারাষ্ট্রে (কংগ্রেস (ই) শাসিত) এইরকম কোর্স চালু থাকার ব্যাপারে এরা সম্পূর্ণ নীরব। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমছে বা স্বাধীনতা (?)-র পরে কোনো সরকারই যে স্বাস্থ্যবিষয়ে নজর দেন নি এইসব কথা এরা পরিষ্কারভাবে গোপন করছে। করণ খুবই স্পষ্ট, আঘাত ব্যুমেরাং হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

উপসংহার

আলোচনার সীমায় এসে পাঠক আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আজকের দিনে যদি সত্যিই গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে দৃঢ় বনিয়াদের ভিত্তিতে উন্নত করতে হয় তবে ডাক্তার তৈরীর চেয়ে প্রয়োজন নার্স, প্যারামেডিকাল স্টাফের সংখ্যা বাড়ানো, আরো বেশী করে বুনিয়াদী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা, স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় অনেক বৃদ্ধি করা, হেল্‌থ সেণ্টারগুলোর উন্নতিসাধন করা, গ্রামে গ্রামে হেল্‌থ সেণ্টার চালু করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে যদি DCMS-এর মাধ্যমে আরো স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের সমাজে আসতেন তাহলে এই প্রকল্পকে সাধুবাদ জানাতাম।

হ্যাঁ সাধুবাদ অবশ্যই জানাতাম পানীয় জলের ব্যবস্থা যদি প্রতি গ্রামে সরকার করতেন, গড়ে তুলতেন ব্যাপক জনস্বাস্থ্য আন্দোলন (আমার বিশ্বাস সেক্ষেত্রে অনেক মানুষ বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসত)। যতদিন দারিদ্র্য আছে, আছে অনশন, ততদিন অপুষ্টিজনিত রোগ দূর হবে না কিন্তু তাবিজ দিয়ে রোগ সারানোর বদ্ধমূল মানসিকতার নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটত, বা ঘটতে সাহায্য করত।

কিন্তু তার বদলে যখন অক্ষমতা গোপন রাখতে নতুন ডাক্তার দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়, জনগণকে সমস্যার প্রকৃত চিত্র না দেখিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্ত করা হয়, জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতিকে অপরিবর্তিত রেখে একটি বিরাট কিছু করে ফেলেছি এমন ধারণা সৃষ্টি করা হয় তখন আপনি একেকি স্টাণ্ট বলবেন না ?

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়
মেডিকাল কলেজ

পরিক্রমা

আদর্শবাদ বনাম ব্যবসায়িক উদ্যোগ

[A recent criticism of the Community Participation concept of promoting appropriate technology has called to its replacement and the adoption of the model of Social Marketing. The basically commercial approach of the latter is criticiscd with reference to the success of Community Participation in China in the matter of production and use of biogas]

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবনের কাজে নেমেছেন নানা সংস্থা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তাঁদের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি সুলভ এবং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে অথচ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরী একই ধরনের যন্ত্রপাতি তুলনায় মহার্ঘ এবং নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও বাজার ছেয়ে ফেলছে। সম্প্রতি New Scientist পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন পল হ্যারিসন।[১] নমুনা হিসেবে হ্যারিসন উল্লেখ করেছেন UNICEF-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কেনিয়ার কারেন (Karen)-এর গ্রামীন প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের কাহিনী। পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তার তুলনা বিরল। এই শ্রম কিছুটা লাঘব করার জন্য কারেন কেন্দ্রের কর্মীরা উদ্ভাবন করেছেন এক বিশেষ ধরনের জালা। বর্ষার সময় বাড়ীর ছাদে বসানো জালায় জল সংগ্রহ করে কুয়া থেকে জল আনার পরিশ্রম কিছুটা কমানো যেতে পারে। এই জালাগুলি গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় উদ্যোগে সহজেই বানানো যায়, মেরামতের কাজে জটিলতা নেই, দামও সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু ভরতুকী দিয়ে অর্ধেক দামে বিক্রী করা সত্ত্বেও করাই (Karai) গ্রামে এমন জালা ১০৬টির বেশী বসানো গেল না (গত বছর মে মাস অবধি) এবং এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যায় ব্যবহারের নজির। অথচ ব্যবসায়িক উদ্যোগে বিক্রীত করোগেটেড টিনের জলাধার একই উদ্দেশ্যে অনেক বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে—অতিরিক্ত দাম (দুই থেকে তিন গুণ), মরচে ধরা, মেরামতির অসুবিধা এবং আরো হাজার ঝামেলা সত্ত্বেও।

ব্যর্থতার এই ধরনের অনেক নজির বিশ্লেষণ করে হ্যারিসন সাহেব সিদ্ধান্ত করেছেন অতিরিক্ত আদর্শবাদই এই উদ্যোগগুলির সাফল্যে বাদ সেধেছে! সাধারণতঃ এই উদ্যোগগুলির মূল লক্ষ্য হয় স্থানীয় মালমশলার সাহায্যে স্থানীয় মানুষের শ্রমে যন্ত্রপাতি তৈরি করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে তা ঘরে ঘরে

১. "Appropriate Technology, how can it reach the village ?" New Scientist, November 20, 1980.

পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা; সাধারণ মানুষকে নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার ভূমিকায় না রেখে তাকে সক্রিয় সহযোগী করার চেষ্টা চলে। হারিসনের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্প্রসারণের এই "Community Participation Model" বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় কোনো প্রকল্প গড়ে তোলার উপযোগী হলেও ঘরে ঘরে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা পৌঁছানোর কাজে তা একেবারেই অক্ষম। বরং এই উদ্দেশ্যে চালু করা উচিত "Social Marketing Model" যার মূল লক্ষ্য হল আরো বাণিজ্যিক তৎপরতা আনা। এই পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতিগুলি একটি কেন্দ্রীভূত উদ্যোগে তৈরী করে প্রচারের ঢক্কানিনাদে চটকদার বিজ্ঞাপনের বাহারে বাজার ছেয়ে ফেলতে হবে। নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে হারিসন উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা; সেখানে তো কাপড় কাচার যন্ত্র ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করার জন্য পাড়ার কারিগর দিয়ে তা তৈরী করতে হয় নি!

হারিসনের লেখাটি বিজ্ঞানকর্মীদের অবশ্যই ভাবিয়ে তুলবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক কৌশলে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিতে প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রয়োগ সম্ভব হবে সমাজ ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও, এ কথায় সায় দেওয়া মুশকিল। বরং ভাবনা চিন্তাগুলো একটু অন্য খাতে বইতে থাকে চীন থেকে পাওয়া নীচের খবরটি[২] পড়ার পর।

বায়োগ্যাস বিপ্লব

শক্তি সংকটের মোকাবিলায় জৈব আবর্জনা থেকে জ্বালানী গ্যাস উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। চীনদেশের সিচুয়ান (Sichuan) প্রদেশ এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই অনেকটা এগিয়েছে। সেখানে Digester নামে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সহজ কাঠামোর এক যন্ত্রে জৈব আবর্জনা থেকে নির্মল জ্বালানী গ্যাস (অর্ধেক থেকে তিন চতুর্থাংশ মিথেন) উৎপন্ন করা হচ্ছে। ঐ প্রদেশের জৈব গ্যাস জনপ্রিয়করণ কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী 1979'র মে মাসের মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বায়োগ্যাস যন্ত্র বসানো হয়েছে। প্রদেশের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে প্রতি দশটি পরিবারের নয়টি ই বাড়ীর কাজে ওই যন্ত্র ব্যবহার করে। রান্না এবং আলো জ্বালানো ছাড়াও বায়োগ্যাসের সাহায্যে সেচ এবং ফসল গুড়ানোর জন্য পাম্প ও মোটর চালান হচ্ছে। একই পদ্ধতিতে ছোটিখাট ট্রাকটর চালানো যায় কিনা তা নিয়ে চলেছে জোর গবেষণা।

রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে এবং সুইডেনের Ambio পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন International Institute for Environment and Development-এর কর্মী শ্রীমতি E Ariane Van-Buren. তাঁর বিবরণ অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে প্রায় দুই লক্ষ প্রযুক্তিবিদকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রযুক্তিবিদরা আবার আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে সাধারণ মানুষকে বায়োগ্যাস প্রযুক্তিবিদ্যা শিখিয়েছেন। অর্থাৎ সিচুয়ানের ঘরে ঘরে বায়োগ্যাস উৎপাদক পৌঁছানোর পরে Community participation বা ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ বাধা হয়নি। বরং এই অংশগ্রহণ-ই বায়োগ্যাস প্রকল্পের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে এই কার্যসূচী ফাঁকা আদর্শবাদের নামান্তর, ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে এবং উপযুক্ত আদর্শে দায়বদ্ধ কর্মীদের কর্মতৎপরতায় তা জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য জাগাতে পারে। সাধারণের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পৌঁছানোর দুরূহ কাজটির সাফল্যের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কোন পথ নেবে?

অমিতাভ দত্ত
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২. Scientific American, January 1981.

Gram : "DWARKESH"
Telex ; 021-2240

Poones : Office : 22-4934
„ : 22-3828
„ : 22-4626
Resi. : 44-8017
: 44-9363

With best compliments from :

PATHARDIH ENGINEERING WORKS
FOUNDERS & ENGINEERS

Works at :
PATHARDIH
(Dhanbad) E. Rly.
Phone : Jharia 61460, 61560, 60595, 60599

Registered Office :
22, Biplabi Rash Behari Basu Road,
(Canning Street)
CALCUTTA-1

রিপোর্ট

বার্নালের ৮০তম জন্মবার্ষিকী স্মরণসভা

জে. ডি. বার্নালের ৮০তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবংগ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা (SWF) এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ যৌথভাবে ২৩শে এপ্রিল একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। এই সভায় প্রায় দেড় শতাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্য এবং তার ওপর শ্রোতাদের আলোচনা সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সভাকক্ষ পূর্ণ ছিল—এ থেকেই বোঝা যায় যে, বক্তারা বার্নালের কাজ সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে গভীর ছাপ রাখতে পেরেছেন। আলোচনা হয়েছে দুই অর্দ্ধে—প্রথম অর্দ্ধে বার্নালের বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধে সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক ও বিজ্ঞান আন্দোলনে বার্নালের অবদান।

প্রথম ভাগের প্রথম বক্তা ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার। তিনি তরল পদার্থের গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে বার্নাল ও তাঁর সহযোগীদের কাজের প্রাঞ্জল বিবরণ রাখেন। তরল পদার্থের অণুগুলি একসংগে জোট বেঁধে ক্ষণস্থায়ী কি ধরণের আকৃতি নিতে পারে তা ব্যাখ্যা করেন। কাঁচ জাতীয় পদার্থের অভ্যন্তরেও কি ধরণের আকৃতি সম্ভব এবং এই আকৃতি ধারণে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম পরমাণুর কি ভূমিকা তা বিশ্লেষণ করেন। বার্নালের গবেষণাকে প্রথম শ্রেণীর আখ্যা দিয়ে বলেন—এর থেকে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিৎ।

দ্বিতীয় বক্তা X-ray Crystallographyতে বার্নালের অবদান প্রসংগে বক্তব্য রাখেন। তিনি হলেন সাহা ইনস্টিট্যুটের অধ্যাপক সুনীল মজুমদার। তিনি বার্নালের আবিষ্কৃত যন্ত্র Goniometer-এর একটি স্লাইড দেখান—যেটি অল্পবিস্তর পরিবর্তন সাপেক্ষে আজও প্রায় সমস্ত Crystallographar ব্যবহার করেন। X-ray diffraction photograph বিশ্লেষণের কাজে 'বার্নাল চার্ট-এর বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করেন। এর পর এঙ্গেলসের "Dialectics of Nature" পড়ে বার্নাল কিভাবে Biomolecule-এর গঠন সম্পর্কিত গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন, তার বিবরণ রাখেন। ১৯৩২ সালে বার্নাল Cholesterol-এর গঠনশৈলী নির্ণয় করে দেখান—রসায়নবিদ Windaus Wieland-এর প্রবর্তিত Sterol-এর সাধারণ গঠন প্রণালী ভুল। স্মরণীয়, H. Wieland তাঁর এই প্রবর্তিত তত্ত্বের জন্য ১৯২৭ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বার্নাল 'Sterol'-এর সঠিক গঠনশৈলী নির্ণয় করেছিলেন বলেই sex hormone-এর কৃত্রিম রাসায়নিক সংশ্লেষণ সম্ভবপর হয়। বার্নালের এক সুযোগ্যা ছাত্রী ডরোথি হজকিন ভিটামিন, পেনিসিলিনের গঠন প্রণালী নির্ণয় করে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৩৪ সালে বার্নালই প্রথম পেপ্‌সিন প্রোটিনের একক কেলাসের X-ray ছবি তুলতে সমর্থ হন এবং ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রোটিনগুলির একটি নির্দিষ্ট গঠনপ্রণালী আছে। পরে তিনি অন্যান্য আরো প্রোটিনের photograph তোলেন। প্রোটিনের X-ray photograph থেকে পারমাণবিক পর্যায়ে গঠন প্রণালী বের করতে হলে phase problem সমাধান করা দরকার। বার্নাল নিজে এটি করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবিত 'isomorphous substitution' পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে M. Perutz হিমোগ্লোবিনের এবং J. Kendrew মায়োগ্লোবিনের পারমাণবিক গঠনবিন্যাস নির্ণয় করেন। এঁরা দুজনেই এই কাজের জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। বার্নাল 'Tobacco Mosaic Virus' এবং 'Tomato Bushy Stunt Virus'-এর X-ray Photography নিতে পেরেছিলেন। বার্নালের উত্তরসূরী বিজ্ঞানীরা উক্ত ভাইরাসের গঠনশৈলী নির্ণয় করেছেন। এইসব গবেষণার জন্য বার্নালকে molecular biologyর অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় অংশে বক্তারা বার্নালের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এবং বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসংগে বক্তব্য রাখেন। প্রথম বক্তা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅংশুতোষ খান ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে বার্নালের কাজের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। 'Cambridge Scientists' Aantiwar Group সৃষ্টি 'Association of Scientific Workers'কে নতুন পথে পরিচালিত করা, 'World Federation of Scientific Workers' সৃষ্টি প্রসংগে বার্নালের কাজের চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেন। তিনি দেখান কিভাবে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল অংশ বার্নালদের গঠনমূলক বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজে সামিল হয়েছিলেন। এই প্রসংগে বার্নাল, হালডেন, লেভী প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ১৯৩১ সালে লণ্ডনে আয়োজিত '2nd International Congress on History of Science'-এ সোভিয়েত প্রতিনিধিদের বক্তব্যের

ধারায় (যেগুলি পরে 'Science at Crossroads' নামের পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়) কিভাবে প্রভাবিত হন তার একটি বিস্তৃত বিবরণ রাখেন শ্রীখান। পরের বক্তা ছিলেন শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর। তিনি বার্নালের 'Social Functions of Science' পুস্তকটির মূল সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন—ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই পুস্তকটির সৃষ্টি। বার্নাল না লিখলেও অন্য কেউ হয়ত ঐ ধরনের একটা কিছু লিখতেন কিন্তু বার্নাল লিখেছেন বলেই এটা একটা 'complete and comprehensive work' হতে পেরেছে। তিনি উল্লেখ করেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের গতিপথ যেভাবে রুদ্ধ হয়ে যাবে বলে বার্নাল ভেবেছিলেন, বর্তমান দুনিয়ার গতিপথ তা ঠিক সমর্থন করে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্নালের ঐ বইটির মূল অনুসিদ্ধান্তগুলি মেনে নিয়ে, বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন করে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার কর্তারা নিজেদের পতন অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন।

আলোচনা শেষে কেউ কেউ এই অভিমত দুঃখের সংগে প্রকাশ করেন যে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বেশীর ভাগ সাধারণ বিজ্ঞানীই এমনকি বার্নালের নামও পর্যন্ত জানেন না। আর যাঁরা জানেন তাঁদের বেশীর ভাগের ধারণা—বার্নাল ত কম্যুনিস্ট, বিজ্ঞানে তাঁর আর অবদান কতটুকু। এই মনোভাব কিসের ইংগিত? এটা কি আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থ বা পাঠক্রমের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক? আজকাল ত' শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে জীববিজ্ঞানের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পদার্থবিদ্যার দিক থেকে জীববিজ্ঞান বুঝতে হলে প্রাণীদেহের অতিকায় অণুগুলির পারমাণবিক গঠন-বৈশিষ্ট জানা অবশ্যকর্তব্য। এইভাবে জানার প্রক্রিয়া ব্যাপকতর হলে বার্নালের কাজের গুরুত্ব শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে পরিস্কার হবে। সবাই বুঝতে পারবে কেন William Bragg বলতেন, X-ray Crystallography-র ভিত্তিপ্রস্তর পাকা হয়ে যাবার পর এই বিষয়কে সব থেকে বেশী উন্নত করতে পেরেছেন জে ডি. বার্নাল। এছাড়াও আরও একটি দিক আছে। সেটা হলো বিজ্ঞানীদের সমাজসচেতন হবার দিক। একটা কথা সাধারণভবে চালুঃ "The coefficient of political conscionsness among the scientific workers is rather low."। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যদি সমাজ থেকে দূরে থেকে শুধুমাত্র নিজেদের ল্যাবরেটরিতেই গণ্ডীবদ্ধ থাকেন তবে বিজ্ঞানের যে চেহারা হবে তা দেখে তাঁরা নিজেরাই একদিন ভয়ে আঁৎকে উঠবেন। যেমনটি হয়েছিল নাগাসকি-হিরোসিমায় এবং পরবর্তীকালে ভিয়েৎনামে। হিরোশিমার লজ্জার কালি যাতে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসের পাতাকে আর না ধুয়েমুছে দিতে পারে সেজন্য বিজ্ঞানকর্মীদের অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার সামাজিক সমস্যাগুলির গভীরে। এভাবে পথচলা সুরু হলে সেই পথের ধ্রুবতারা হিসেবে যাঁর নাম করা হবে তিনি হলেন অধ্যাপক জে. ডি বার্নাল।

সুনীল মুখোপাধ্যায়
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিঃ

বিজ্ঞান পদযাত্রা - একটি অভিজ্ঞতা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম খড়্গপুর আই আই টি'র কিছু ছাত্র-শিক্ষক-গবেষককর্মীর উদ্যোগে গত ৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এক বিজ্ঞান পদযাত্রা। যাত্রাপথ নির্দিষ্ট হয় আধুনিক বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটা আঁচও যাদের জীবনযাত্রার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি দেশের সেই বৃহত্তর অংশের মানুষের ক'জনের উঠোন-দাওয়ার গা ঘেঁষে। বিজ্ঞানচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ঘেরাটোপের বাইরে এসে মানুষকে এবং তার পরিবেশকে দেখার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। এই দেখাটাই ছিল এই পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য। আনুষঙ্গিক হিসেবে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিছু পোষ্টার যাতে লেখা ছিল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে জড়িত কিছু খুঁটিনাটি প্রশ্নের উত্তর—যা আমরা বুঝতে শিখছি বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়ে।

"জনগণের বিজ্ঞান আন্দোলন"—এই ফেষ্টুনের নীচে সেদিন সামিল হয়েছিলেন আই আই টি চত্বরের বাইরেরও বেশ কিছু মানুষ এবং সংগঠন। যেমন স্থানীয় কিছু স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, মেদিনীপুরের 'দেশকাল' পত্রিকা, উড়িষ্যার বুরলা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের "সোসাল সার্ভিস অর্গানাইজেশন", কলকাতার "ইয়ং সায়েন্টিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন", "হেল্‌থ এ্যাণ্ড সোসাইটি" এবং "পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা"। পরিচালনায় ছিলেন আই আই টি'র "সোসাল সার্ভিস স্কীম ইউনিট" এবং খড়্গপুরের "সায়েন্স এডুকেশন গ্রুপ"। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল মানবদেহ, স্বাস্থ্য ও সমাজ বিষয়ক শ'খানেক পোষ্টার সমেত একটি মিছিল নিয়ে কয়েকটি গ্রাম ও হাটের পথ পরিক্রমা করা এবং পথে পূর্ব নির্দিষ্ট দুটো স্কুলে এবং একটি হাটে থেমে গ্রামের মানুষদের কাছে পোষ্টারের বিষয়গুলি সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করা। বিষয় নির্বাচন এবং পোষ্টার প্রস্তুতের ভার ছিল আই আই টি'র ছাত্রছাত্রীদের ওপর। বক্তব্য হাজিরের কার্যকরী পন্থা নির্ণয়ের ভারও ছিল তাদেরই ওপর। পোষ্টারের বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল মানবদেহের বিবর্তন, মানুষের শরীর সংগঠন ও বিভিন্ন অংশের কার্যকলাপ, সাধারণ রোগ ও জীবাণুর পরিচয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও পরিবেশ, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, জন্মনিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও পুষ্টি, সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য,

গ্রাম ও শহরের ধনবৈষম্য ইত্যাদি। আর ছিল বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর শ্লোগান। পোষ্টার ইংরেজী ভাষায় লিখিত ছিল। উদ্দেশ্যের পক্ষে খুবই বেমানান সন্দেহ নেই। তবে মনে হয় আই আই টি'র বিভিন্ন ভাষাভাষী ছেলেমেয়েদের এই আয়োজনে সামিল করতে বাধ্য হয়েই এমন করতে হয়েছে।

ছাত্রছাত্রী গবেষক শিক্ষক আশপাশের লোকজন ও বাইরের সংগঠনের প্রতিনিধি মিলে মিছিলে সামিল হন প্রায় শ'আড়াই মানুষ। এর সাথে পথে যোগ দেন আরও কিছু স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও সাধারণ মানুষ। সকালের মিঠে রোদের ছোঁয়া নিয়ে শুরু হয় মিছিল। দেহে-বসনে-কথোপকথনে ঝলমলে ছেলে মেয়েদের কলতান, কাঁধে হেলান নানান রঙের পোষ্টার, আই আই টি চত্বরের সুদৃশ্য ঘরবাড়ীর সারি আর গাছ-গাছালি ঘেরা প্রশস্ত পথ—এই সব নিয়ে শুরুর মেজাজে ছিল উৎসবের আঁচ। একটু পরেই প্রাচীর পেরিয়ে মিছিল গিয়ে পড়ে ঘিঞ্জি বসতিপূর্ণ এক এলাকায়। শনের চাল মাটির দেওয়াল একমানুষ উঁচু ঘরদোর। এখানে থাকেন আই আই টি'র কিছু শ্রমিক কর্মচারী। দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর চোখেমুখে বিস্ময় ও কৌতূহলের ছাপ। কারণ এমনটি আর কখনও হতে দেখেননি তাঁরা। মিছিল থেকে শ্লোগান ধ্বনিত হয়—"তোমার আমার রক্ত লাল / বিভেদ ছড়ায় ভেড়ার পাল"।

মিছিল প্রথম থামে আয়মা গ্রামে ছত্রিশগড় স্কুলে এসে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ও দু' একজন মাষ্টার মশায় দাঁড়িয়েছিলেন মিছিলকে স্বাগত জানাতে। ওখানে পৌঁছে জনকয় ছেলে লাউড স্পীকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের পথে—হাঁক দিয়ে জানান দিতে আমাদের উপস্থিতি। পড়শীরা আছেন দু' চারজন। ছেলেদের ক'জন এক একটি পোষ্টার ওপরে তুলে ধরে কথোপকথনের ভঙ্গীতে বোঝাতে চেষ্টা করেন পোষ্টারের বিষয়বস্তু। শ্রোতাদের থেকে দু' একজন প্রশ্নও করেন কিছু। এপাশ থেকে উত্তর দেবারও চেষ্টা হয়। বোঝা যায় খুব হৃদয়গ্রাহী হয়নি উত্তরগুলো। মনে হয় কেতাবী ঢংয়ের বলার ভঙ্গিই এজন্য দায়ী।

এর পরের হল্টেজ নিমপুর টেংড়াহাট। বেশ জমজমাট চারদিক। সপ্তাহে দু'দিন বসে হাট। বহু দূরদূরান্ত থেকে আসেন মানুষ। সবাই ব্যস্ত। এর মাঝে আমাদের মিছিল অনেকেরই নজর কাড়ে এবং আগ্রহী করে জানতে কাদের এবং কেন এই মিছিল। কিন্তু ধরে রাখা যায়নি কাউকেই। তাই ছেলেদের শত ঢাকঢোলের বোল কিংবা লাউড স্পীকারের আহ্বান তেমন সাড়া জাগায়নি হাটের মানুষের মধ্যে। বোধ হয় খুব অপ্রত্যাশিতও ছিল না এমনটি। কারণ এটা মেলা নয়—হাট। প্রয়োজনে এসেছেন সবাই। কেনা-বেচা সেরে সূর্য ডোবার আগেই ফিরতে হবে ঘর—হয়তো যেতে হবে মাইল পাঁচ-সাতেকের পথ। এতে অনভিজ্ঞ ছেলেরা একটু হতাশই হয়েছেন। এমন আন্তরিক একটি প্রয়াসে মানুষের এমন অনাগ্রহ কিছুটা বেদনাদায়ক বইকি। উৎসবের মেজাজে চিড় ধরে—ফলে উৎসাহেও। তবে এর মাঝেও দু'চারজন ছেলেকে উদ্যম হারাতে দেখিনি শেষতক্। অভ্যস্ত রুটিনের বাইরে এসে অনেকেই একটু বেকায়দায় পড়বেন—স্বাভাবিক। তাই ক্লান্ত পা টেনে নিতে পোষ্টার হয়েছে বোঝা। আবার অনেকেই দেখেছি কায়দা করে এই বোঝাকেই করেছেন রোদ ঠেকাবার বর্ম।

টেংড়াহাটে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিয়েছিলাম আমরা। এরপর গেলাম হিয়াড়ী স্কুল। টালির চাল মাটির দেওয়াল ঘেরা ছোট্ট স্কুলের বাড়ী। কজন ছেলে চলে যায় গ্রামের দিকে—জানান দিতে। তবে গ্রাম থেকে তেমন কারুর সারা পাওয়া যায় না। মিছিল প্রায় আবার রওনা হবে এমন সময় হাজির দেখলাম জনা বিশেক লোক—গ্রাম থেকে এসেছেন। কয়েকজন ছাত্র উৎসাহ ফিরে পান। পোষ্টারগুলো দেখিয়ে শোনালেন কিছু কথা। শুনলেন ও দেখলেন ওনারা—অবশ্যই বিস্ময়ের চোখে। এতক্ষণে বেশ কিছু পদযাত্রী অধৈর্য হয়ে পড়েছেন নিশ্চিন্ত ডেরায় ফেরার তাগিদে।

এবার ফেরার পালা। সূর্য অনেকখানি হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। মিছিল ফিরে চলেছে প্রায় নিঃশব্দে। মনে মনে সারা দিনের ঘটনাবলীর অনুরণন। হিসেব করছিলাম নিজের মনে। ভাবছিলাম মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রায় আটকা পড়া মানুষগুলোর কাছে এমন সব স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশনের বুলি অবান্তর কচকচি বলে ঠেকতে বাধ্য। তবুও এমন প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে কারণ শিক্ষার দুর্লভ সুযোগপ্রাপ্ত জনসংখ্যার দু' একজনও যদি এই পরিচিতির মধ্য দিয়ে ওই মানুষগুলোর বৃহত্তর জীবন সংগ্রামে তার কার্যকরী কোনো ভূমিকা আছে কিনা খুঁজে দেখার প্রয়াস পান।

গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়, রাজচন্দ্রপুর (হাওড়া)-এ গ্রামীন সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রথম নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের আয়োজক ছিলেন নবারুণ সাহিত্য গোষ্ঠী (বিজ্ঞান শাখা)। এই সংগঠনটির কার্যকলাপের রিপোর্ট ভবিষ্যতে এই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হবে।

জীবনালেখ্য ঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

গত আটই এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-র জীবন শেষ হলো। অনেক শারীরিক অসুস্থতা, সম্মান ও অপমান, প্রশংসা ও বিতর্কের পথ বেয়ে প্রায় ছিয়াশী বছর বয়সে অবশেষে মৃত্যু। কিশোরদের ভাল-লাগা হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বই 'করে দেখ'-র খণ্ডগুলোর লেখাতে একজন গোপাল ভট্টাচার্য। আবার 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইয়ের পাতায় পাতায় এক গভীর গবেষণায় নিবিষ্ট প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য। কীটতত্ত্ব বা Entomology-র এতো সুন্দর কাজ বাংলা লেখার দক্ষতার সাথে মিশে এক অনন্য স্বাদ এনেছে। আর বাংলা ভাষায় নিজের গবেষণার কথা বিশদে না হলেও বাংলায় লেখা প্রথম শুরু করেছিলেন জগদীশ বসু। সময় কালটাই ছিলো সে রকম। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিও হয়েছেন জগদীশ বসু—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের টান্‌টা তিনিও মিশিয়েছিলেন বিজ্ঞানের সাথে, এ শতকের প্রথম দশকেই। তাই সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসী' (1919)-তে প্রকাশিত পচা গাছপালার আলো বিকিরণ সম্পর্কে গোপাল ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ পড়ে জগদীশ বসু খুঁজে আনলেন প্রথাগত শিক্ষার বাইরের এই বিজ্ঞানীকে—একেবারে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার সুযোগ দিয়ে, সেটা 1921 সাল—সেই থেকে প্রায় বাহান্ন বছর গোপাল ভট্টাচার্য এক টানা যুক্ত ছিলেন। এখানে থেকেই আশ্চর্য সব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে গেছেন। সবটুকুর মূল্যায়ন হয়নি আজও—কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকের চোখে পড়েছে, বেশ কয়েকটা গবেষণা আন্তর্জাতিক মানের। বেশীর ভাগ গবেষণাপত্র বাংলা ভাষায় লেখা। কয়েকটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয় Transactions of Bose Institute এবং Science and Culture পত্রিকায়। ব্যাঙাচির রূপান্তরে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রভাব সম্পর্কে গোপাল ভট্টাচার্যের গবেষণা বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি-কে চিন্তিত করে। কিন্তু তার অনেক পরে বিজ্ঞানী ওয়েবার-এর গ্রন্থ Biochemistry of Animal Development-এ উল্লিখিত হয় গোপাল ভট্টাচার্যের গবেষণা পত্রগুলো। আরো কয়েকটি কাজ পাশ্চাত্যে অগোচর থেকে গেছে আজও নানা কারণে—অথচ প্রায়ই একই গবেষণা হয়েছে বা হচ্ছে, প্রায়ই সিদ্ধান্ত এসেছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মহলে, গোপাল ভট্টাচার্যের কাজের মতো।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় শৈশব জীবন শুরু হয়েছে খুব সাধারণ অর্থনীতিক অবস্থায়। ভালো ছাত্র ছিলেন—কিন্তু প্রাক্-স্নাতক অবস্থাতেই লোনসিং গ্রামে শিক্ষকতা করতে হয় সংসারের চাপে। ফরিদপুরের 'শতদল' পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ব্যঙ্গ-কবিতায় পূর্ণ করে। আর গড়লেন গ্রামের জারিগানের দল। বাংলাদেশের জারিগানের ভেতর আজও না কি "গুরু গোপাল ভট্ট"র নাম শোনা যায়। সমাজের অবস্থার সমালোচনায় লিখেছেন ছড়া, গান বা কবিতা। বিজ্ঞানের গবেষণার সুযোগের আগে গোপাল ভট্টাচার্য শিক্ষকতা ছাড়াও কখনো পাটকল বা টেলিফোনে কাজ করে আর্থিক চাপকে মোকাবিলা করেছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার তিনি ছিলেন দীর্ঘদিনের প্রধান সম্পাদক। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের কাজে তাঁর শ্রমটুকু একটানা কয়েক দশক ধরে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষার বাইরের বিজ্ঞানী হিসাবে আর মাতৃভাষায় যথার্থ বিজ্ঞান চর্চার এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গোপাল ভট্টাচার্যকেও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার দায়িত্ব থেকে কয়েক বছর আগে সরতে হয়েছিলো—তিনি বিজ্ঞান স্নাতক নয় বলে! বিতর্কের ঝড় উঠেছিলো—কিন্তু মৃদুমন্দ বাতাসের থেকে জোরালো নয়। জোড়াতালি দিয়ে, বৃদ্ধ গোপাল ভট্টাচার্যের হাতে এসেছে রবীন্দ্র পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি এস-সি।

মনে পড়ে—সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ডকটরেট ছিলো না বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান পদ গ্রহণে আইনে আটকালো। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কাছে সুপারিশ চাইতে গেলে, অবাক হয়ে তিনি বলেছেন—বসু তোমার পদার্থবিদ্যায় অবদান কি এখনো ওরা জানে না? কারণ, তার আগেই বিশ্ববন্দিত প্রবন্ধ লিখে সত্যেন বসু বিজ্ঞানের দরবারে অনিবার্য নাম।

হয়তো বলা যায়—জগদীশ বসুর মূল্যবান 'আবিষ্কার' বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য। যেমন—বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভীর এক কালের গর্ব ছিলো, বই বাঁধানোর দোকানে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার মাইকেল ফ্যারাডে-কে পেয়েছেন।

এই গোপাল ভট্টাচার্যকে আমরা কজন জেনেছি?

ভারতে প্রথম গবেষণাকেন্দ্র

[৪র্থ পৃষ্ঠার পর]

তালিকাটি থেকে আরেকটি ব্যাপার বোঝা যায়, ৭৮-৭৯ সাল নাগাদ হঠাৎ যেন সব সংখ্যাই খুব বেড়ে গেছে। তার কারণ ১৯৭৬ এর শতবর্ষ। শতবর্ষের দৌলতে, এ্যাসোসিয়েশনের চেহারাটা অনেক পাল্টেছে। আজ যে সব আধুনিক যন্ত্রপাতির সমাবেশ দেখা যায় তার অনেকগুলি গত চার বছরে এসেছে। স্কীমের সংখ্যা, স্কলারদের সংখ্যা, অ্যাকাডেমিক স্টাফের সংখ্যা সবই বেশ কিছু বেড়েছে। আগের বছরগুলিতে যে মন্দাটা এসেছিল তা কিছুটা কেটেছে।

পরিসংখ্যান বা বার্ষিক Report-এ অনেক কথাই লেখা থাকে না। অথচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা থেকে যায়। যেমন কাল্‌টিভেশন সম্পর্কে বলার কথা এই যে কাউন্সিলে সকল স্তরের কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব আছে এবং এ্যাসোসিয়েশন-এর ইতিহাস একটু অন্য রকম হওয়ায় সাধারণ সভার অস্তিত্ব এখনো আছে। যদিও আজ সাধারণ সভা তার সাধারণত্ব মোটামুটি হারিয়েছে। আজ যাঁরা সাধারণ সভায় যান এবং সরব হন, তাঁদের বেশীরভাগই ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী। কিন্তু তাও বলব এই দুটি ব্যাপার থাকা দরকার। এছাড়া অন্যান্য যেসব কমিটি আছে তাতেও সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিধিত্ব আছে। তবে কমিটি থাকলেই সব হয়না তার প্রমাণ হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। সর্বোচ্চ কমিটি Council ছাড়াও আছে Academic Board, Workshop Committee, Library Committee, Construction Committee, Scheme Committee, Hostel Committee এবং এই রকম আরো তিন চারটে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই কমিটিগুলি ঠিকমত কাজ করে না এবং করলেও অনেক সময়ই তাদের কথা শোনা হয় না। আবার কখনও কখনও কাজ পেছোনোর জন্য কমিটি তৈরী করা হয়। তারপরে ধরুন লাইব্রেরী, শুধু জার্নাল এলেই চলে না সেগুলিকে ঠিকমত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা লাইব্রেরীর প্রধান কাজ। জায়গার অভাবে লাইব্রেরীটি প্রায় বই-এর গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। জানালার কার্নিশ থেকে শুরু করে সব জায়গায় জার্নাল রাখা আছে। পুরানো জার্নাল-এর ঘরটিতে ঢোকা যায় না, আলো বাতাসের অভাবে, অথচ এখানকার academic staff-এরা এ ব্যাপারে কতটা আশঙ্কিত এবং পুনরুজ্জীবনে কতটা উৎসাহী তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এছাড়া অভিযোগ আছে আরো নানা ব্যাপারে। Workshop সম্পর্কে অভিযোগ বহুদিনের। সরকারী টাকা সময়মত খরচ না হওয়াটা একটা পুরোনো অভিযোগ। অন্তত চার পাঁচ বছর ধরে হস্টেল, প্রধান Building, Liquid N_2 plant, liquid He plant, Gas plant ইত্যাদির টাকা খরচ না হয়ে পড়ে আছে। এখন সবাই পুরোন ডিরেকটরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সাধু সাজছেন। প্রশ্ন আছে Director's Research এবং Central Scientific Service সম্পর্কেও। সর্বোপরি আছে কর্তৃপক্ষের অনমনীয়তা, গোঁয়াতুর্মি এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাব। সম্প্রতি যেন এ্যাকাডেমিক কর্মীদের আন্দোলনের সূত্রে অ্যাসোসিয়েশনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কর্মী অসন্তোষ থেকে নিশ্চয়ই এর শুরু কিন্তু কর্তৃপক্ষের একরোখা গোঁয়াতুর্মিও এর জন্য দায়ী। এঁরা সকলেই নামী দামী বিজ্ঞানী, কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। এসবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গবেষণার স্বাভাবিক পরিবেশ, গবেষণার সুস্থ পরিবেশের কণামাত্রও এখানে নেই। সম্প্রতি সে উদ্দেশ্যে স্কলারদের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সকল স্তরের কর্মীদের সহযোগিতায় তা সফল হয়ে উঠুক, এটাই আশা করি।

অশোক সরকার
আই. এ. সি. এস

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে মতামত প্রকাশের একটি মঞ্চ। সমসাময়িক ও বিতর্কমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানকর্মী ও ছাত্রদের রচনা ও মতামত প্রকাশে আমরা আগ্রহী। বিশেষ উল্লেখ না থাকলে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই লেখকের নিজস্ব বক্তব্য, সম্পাদকমণ্ডলীর মতামতের প্রতিফলন নয়।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : তিন টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :

সম্পাদক, **বিজ্ঞান ও বিজ্ঞনকর্মী**
C/o. ডি. এস. এণ্টারপ্রাইস
৫২/১সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১২

Registration No. R. N 34929/79 "Registered" Postal Regi. No. WB/CC 113

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক,
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী।

একজন স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে বিস্মিত হয়ে সকলের জ্ঞাতার্থে ঘটনাটি জানাচ্ছি। একজন বিজ্ঞান সহকর্মী হিসেবে এ ঘটনায় আমি লজ্জিত না হয়ে পারছি না।

গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে আমাদের ওয়ার্কশপে কর্মরত অবস্থায় একজন ছাত্রী হাতে আঘাত পায়। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে দেখে দ্রুত পাশের বাড়ী সাহা ইনষ্টিটিউটের মেডিকেল ইউনিটে যাই। ছাত্রীটিকে নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে ওপরে গিয়ে ডাক্তারবাবুর খোঁজ করলে আমাকে জানানো হয়—ডাক্তারবাবু ঘুমোচ্ছেন। একটু অবাক না হয়ে পারি না। তখন বাজে বেলা পৌনে পাঁচটা। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমিও তখন খুবই উদ্বিগ্ন। তাই উপস্থিত জনকয়েকের বিশেষ বাধাদান সত্ত্বেও কৌতূহলী হয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মেরে ডাক্তারবাবুর খোঁজ করি। দেখি ঘরের পেছনের রুগী দেখার ঘরে বিছানায় শুয়ে সত্যিই তিনি ঘুমোচ্ছেন। এনাদের জিজ্ঞাসা করি উনি অসুস্থ কিনা। —জানলাম নয়। ওনার সাধের ঘুমটা (কাঁচা!) না ভাঙানোই যুক্তিযুক্ত মনে করি। উপস্থিত স্বাস্থ্যকর্মী ভদ্রলোককে অনুরোধ করি একটু সাহায্যের জন্য। উত্তরে ওনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। উনি দ্রুত পোষাক বদ্‌লে বেড়িয়ে যেতে যেতে বললেন - এখানে ওসব ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে নিয়ে যান।

—ভাবলাম হবেও বা। তবে একটু খটকা থেকে গেল। যেখানে সামান্য একটু first aid এর ব্যবস্থা নেই, তাহলে সেখানে একজন ডাক্তার, বেশ কয়েকজন লোকলস্কর, খান কয়েক ঘর, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি আছে কোন কামে? —না কি সব থাকলেও বাইরের ডিপার্টমেন্টের জন্য নেই। কিন্তু তাহলেও medical ethics কি বলে? আর আপনারাই বা কি বলেন?

ইতি—
ওয়ার্কশপ সুপারিনটেনডেন্ট,
ফলিত বিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা
এপ্রিল ১৪, ১৯৮১

COOK WITH

ROSOI
VANASPATI

Product of

ROSOI VANASPATI & PRODUCTS LIMITED

CALCUTTA

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও
মুদ্রাকর প্রেস, ১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।